কা । না । ডা

২০০৫ সালে সোয়া দুই লাখ ইমিগ্র্যান্ট নেয়া হবে

জসিম মল্লিক *টরন্টো থেকে*

বাংলাদেশ থেকে যারা ইমিগ্র্যান্ট হয়ে কানাডা আসতে চান তাদের জন্য একটি সুখবর হচ্ছে কানাডা ইমিগ্রেশন আগামী বছর সোয়া দুই লাখ নতুন ইমিগ্র্যান্ট নেয়ার টার্গেট করেছে বলে ইমিগ্রেশন সূত্রে জানা গেছে। তবে কানাডা আসার আগে একটি বিষয় পুনরায় ভাবতে অনুরোধ করছি সেটা হচ্ছে, বর্তমানে কানাডায় চাকরির অবস্থা খুবই ভয়াবহ। ক্যানাডিয়ান ডিগ্রি বা অভিজ্ঞতা ছাড়া এখানে কাজ প্রায় পাওয়াই যায় না। বাংলাদেশে আপনি যতবড় ডিগ্রিধারীই হোননা কেন তা এ দেশে কোনোই কাজে লাগবে না। ভালো চাকরির ক্ষেত্রে সাদাদের প্রাধান্যই বেশি। বাংলাদেশ থেকে দলে দলে ইঞ্জিনিয়াররা এ দেশে এসেছেন কিন্তু তারা এখন চরম হতাশায় ভুগছেন। অন্যান্য পেশায় যারা এসেছেন তারাও অন্য যেকোনো সাধারণ একটা কাজের জন্য লড়াই করছেন। কানাডা বিশাল দেশ, ধনী দেশ হওয়া সত্ত্বেও চাকরির বাজার খুবই সংকুচিত।

যাই হোক। আগামী বছর যে সোয়া দুই লাখ ইমিগ্র্যান্ট নেয়া হবে এর মধ্যে ৬০ ভাগ হবে দক্ষ শ্রমিক আর ৪০ ভাগ হবে ইমিগ্র্যান্টদের পরিবার ও রিফিউজি ক্যাটাগরিভুক্ত। নতুন ইমিগ্র্যান্টদের আবেদনপত্র যাতে দ্রুত প্রসেস করা হয় সে ব্যাপারেও ইমিগ্রেশন থেকে বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে জানা গেছে। উল্লেখিত টার্গেট কিংবা লক্ষ্যমাত্রা যেন কোনোভাবে ব্যাহত না হয় সে ব্যাপারেও কর্তৃপক্ষ সবিশেষ সরকারি উদ্যোগের তাগিদ দিয়েছে। সূত্র আরো জানায়, নতুন ইমিগ্র্যান্টদের ব্যাপারে একটি জাতীয় নীতি প্রণয়নের ওপর প্রভিন্সসমূহ বিশেষ করে অন্টারিও থেকে অটোয়ার ওপর দীর্ঘদিন ধরে চাপ সৃষ্টি করে আসছে। ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের বর্তমান পদক্ষেপে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, অটোয়াও বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। বড় সিটির মধ্যে বিশেষ করে টরন্টোর মতো মেগা সিটির পক্ষ থেকে নতুন ইমিগ্র্যান্টদের বসতি স্থাপন ও কাজ পাওয়ার ব্যাপারেও ফেডারেল সরকারকে সাহায্যের হাত প্রসারণের আহবান জানানো হয়েছে। সূত্র জানায়, নতুন ইমিগ্র্যান্টদের ব্যাপারে 'ইমিগ্রেশন ফ্রেমওয়ার্কে'র মাধ্যমে প্রভিন্স, টেরিটরিসহ অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের মাঝে একযোগে কাজ করারও উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। ইমিগ্রেশন সূত্রে জানা যায়, কানাডায় গত বছর ২ লাখ ২১ হাজার তিনশ' বায়ান্ন জন নতুন ইমিগ্র্যান্ট এসেছেন। এর মধ্যে ৬০ ভাগই অন্টারিওকে তাদের নতুন আবাসভূমি হিসেবে বেছে নেন। তাদের মধ্যে ৮০ ভাগই বৃহত্তর টরন্টোতে নোঙ্গর গাড়েন।

jasim-mallik@hotmail.com

শাহনাজের যুক্তরাষ্ট্র সফর

নিউইয়র্ক থেকে **আকবর হায়দার কিরণ**

সংগীতপ্রেমীদের হৃদয়ে এক বিরাট আলোড়ন তুলে গেলেন শাহনাজ রহমতউল্লাহ। যুক্তরাষ্ট্র সফরে এসে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বেশ ক'টি লাইভ কনসার্ট পরিবেশন করে শাহনাজ আবার প্রমাণ করে গেলেন তিনি আছেন, বহাল তবিয়তেই আছেন। এতোদিন পরও তাঁর অসাধারণ কণ্ঠ এবং গায়কী ঠিক আগের মতোই আছে। এক মাসের বেশি সময় যুক্তরাষ্ট্র অবস্থানকালে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে গান করার পর শাহনাজের শেষ কনসার্ট ছিলো নিউইয়র্কে। এই অসাধারণ জনপ্রিয় শিল্পীকে সফরে আমন্ত্রণ জানান ডিসকো রেকর্ডিংয়ের শাহীন রহমান। নিউইয়র্কে একই উপলক্ষে শাহনাজ রহমতউল্লাহর গোল্ডেন হিটস সিডির শুভ উদ্বোধন করেন কনসাল জেনারেল মহসীন আলী খান। প্রায় মধ্য রাতে যখন তার গান শেষ তখনো প্রতিটি শ্রোতা-দর্শক গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় ছিলেন। অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে শাহনাজ তার ভক্তদের অটোগ্রাফ দেন। নিউইয়র্ক কনসার্টের সঙ্গে শাহনাজ ইন্টারনেটের প্যালটক ওয়েবসাইটে প্রায় তিন ঘণ্টা লাইভ অনুষ্ঠান করেন। আনন্দবিচিত্রা আয়োজিত এ অনুষ্ঠান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রবাসী বেশ কয়েকশ' বাংলাভাষী প্রাণভরে উপভোগ করেন। শাহনাজ তাঁর ভক্তদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন, তাদের অনুরোধে অনেক গান করেন। এর আগে নিউইয়র্কের বাংলা টিভিকে দেয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে শাহনাজ তার ভাই নায়ক জাফর ইকবালের বিশেষ স্মৃতিচারণ করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি তাঁর অন্যতম সঙ্গীতগুরু মেহেদী হাসানের কথাও উল্লেখ করেন। নিউইয়র্কে আয়োজিত শাহনাজের সঙ্গীতানুষ্ঠানে কোলকাতার অন্তু শান্তনু ও ঢাকায় সুরভী ইসলামও সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

কো । রি । য়া

দক্ষিণ কোরিয়ার গণমাধ্যমে বাংলাদেশী এক তানিয়ার কথা

৮ বছর আগে তিন বছরের শিশু সন্তান রেখে জীবিকার অন্বেষণে বাবা চলে এসেছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ায়। স্ত্রী ও একমাত্র শিশু সন্তান তানিয়াকে কাছে পেতে বাবা ব্যাকুল থাকতেন। কিন্তু অর্থের জন্যে আপনজন থেকে অনেক সময় দূরে থাকতে হয় বলে এই ব্যাকুলতাকে চেপে রেখেছিলেন বাবা। তিন বছরের বৈধতার মেয়াদ শেষে তানিয়ার বাবা অবৈধভাবে কোরিয়ায় কাজ করতে থাকেন। দেশে যাওয়াটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে তানিয়ার বাবার। তিনি এক সময় সিদ্ধান্ত নেন, যেকোনো প্রকারে হোক মেয়ে তানিয়া ও স্ত্রী পারভিন আক্তারকে কোরিয়া নিয়ে আসবেন। কোরিয়ার এয়ারপোর্টে এ জাতীয় মেয়ে আসা ঝুঁকিপূর্ণ এবং এদেরকে ইমিগ্রেশন এয়ারপোর্ট থেকে বিদায় করে দেয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। তবুও তানিয়া এবং তানিয়ার মা কোরিয়ায় প্রবেশের অনুমতি পেয়েছিলেন। তানিয়ার বাবা যে কারখানায় অবৈধভাবে কাজ করতেন সেই কারখানার মালিকের বদান্যতায় কারখানার ভেতরেই তানিয়া এবং তার বাবা-মার থাকার ব্যবস্থা হয়ে যায়। ইতিমধ্যে তানিয়া পাড়ার কোরিয়ান ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলে এবং কোরিয়ান ভাষা অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করে ফেলে। একদিন ফ্যাক্টরি ঘেরাও করে কোরিয়ান ইমিগ্রেশন তানিয়ার বাবা-মাকে অবৈধ অভিবাসনের জন্য পাকড়াও করে দেশে পাঠানোর জন্যে গাড়িতে তুললে তানিয়া ইমিগ্রেশন অফিসারদের সঙ্গে সুস্পষ্ট কোরিয়ান ভাষায় তর্ক বাধিয়ে দেয়। তানিয়া তার বাবা-মাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য বিনীতভাবে যুক্তি প্রদর্শন করতে থাকে। তানিয়ার কথায় ইমিগ্রেশন অফিসারের মায়া হয় এবং সবাইকে ছেড়ে দিয়ে কোরিয়ায় কিছু দিন থেকে স্বদেশে ফিরে যেতে তানিয়ার বাবাকে পরামর্শ দেয়। তানিয়ার বাবা কর্মস্থল পরিবর্তন করে স্ত্রীসহ অন্যত্র কাজ করে তানিয়াকে স্কুলে ভর্তি করে দেন। কিছুদিনের মধ্যে তানিয়ার পারফরমেন্সে স্কুল কর্তৃপক্ষ মুগ্ধ হন। বিভিন্ন বিদেশী সাহায্য সংস্থা এবং সেল্টারগুলো তানিয়ার খোঁজখবর নিতে থাকে। কোরিয়ার গণমাধ্যমে তানিয়ার ছবি আসতে থাকে। কোরিয়ার কোনো টিভি চ্যানেল তানিয়াকে নিয়ে প্রোগ্রাম করা থেকে বাদ পড়েনি। সরকারি টিভি চ্যানেল K.B.S গত সপ্তাহ থেকে তানিয়া ও তার মা-বাবাকে নিয়ে ধারাবাহিক অনুষ্ঠান করছে। কোরিয়ার সংবাদপত্রগুলো প্রায়ই তানিয়াকে নিয়ে ফিচার তৈরি করে রিপোর্ট করছে। সংখ্যাটি কেউ পাঠালে বন্ধুত্ব হবে।

মোরশেদ আলম (প্রিন্স), Taelim Air Servicez Engineering Co. Ltd. 668-1 Gungyong-Ri, Dochuck-Myun, Kwangju-Gun, Kyunggi Do-464-880, South Korea, Ph. 016-9217-1298

জা । পা । ন

উত্তরণ-এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

মাতৃভূমি বাংলাদেশের শিল্প সংস্কৃতিকে বুকের গভীরে লালন করে 'উত্তরণ (Uttoron)' বাংলাদেশী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী জাপান, ১৯৮৮ সালের নবেম্বর মাস থেকে যাত্রা শুরু করে। সেই হিসেবে 'উত্তরণ' ১৬ বছরের যৌবনে পা দিয়েছে। অঙ্কুর থেকে হাঁটিহাঁটি পা পা করে শিশু, কৈশোর পার হয়ে আজ যৌবনে। এই কৃতিত্ব যেমন উত্তরণ শিল্পীগোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার, তেমনি কৃতিত্বের দাবিদার জাপান প্রবাসী সমস্ত বাংলাদেশীদের। যারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন। প্রবাসে একটি সংগঠনকে ১৬ বছর টিকিয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করে দর্শক সমাগম ঘটিয়ে আনন্দ দেয়া কম কথা নয়। আর তা যদি হয় আমাদের বাঙালি কমিউনিটিতে। যেখানে কর্মীর চেয়ে নেতার সংখ্যা বেশি এবং পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর Tokyoতে। যেখানে জীবনযুদ্ধে ব্যয় করতে হয় প্রতিটি মুহূর্ত। উত্তরণ সেই অসাধ্য কাজটি সমাধা করেছে। বরাবরের মতো এবারও অনুষ্ঠানকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। তবে একটু ব্যতিক্রমধর্মী। প্রথম পর্বে প্রথমেই গত বছরের নতুন মুখদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। পরিচয় করিয়ে দেন তানিয়া ইসলাম মিথুন এবং ইতো কায়ো (Ito Kayo)। পরিচয়পর্ব শেষে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন উত্তরণ কমিটির লিডার মান্না চৌধুরী। তিনি প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও আগত দর্শকদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে অনুষ্ঠান সাজানোতে ভুলত্রুটি থাকলে তার জন্য অগ্রিম ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

বাংলাদেশ দূতাবাসের মাননীয় রাষ্ট্রদূত এম সিরাজুল ইসলাম তার বক্তব্যে উত্তরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং বাংলা সংস্কৃতিকে জাপানে আরো বেশি করে প্রচার করার জন্য প্রবাসী বাংলাদেশী সমাজকে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে গরিব হলেও বাংলা সংস্কৃতি অনেক পুরনো এবং সমৃদ্ধিশালী।

দ্বিতীয় পর্বের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরুতেই যেরোম গোমেজ (Jerom Gomez) বিগত অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা থেকে একটি ব্যক্তিক্রমধর্মী আহ্বান জানান। তিনি বলেন, একটি অনুষ্ঠান সাজাতে হলে সব ধরনের দর্শকদের চাহিদার দিকে খেয়াল রাখতে হয়। অনুষ্ঠান তৈরি এবং সংগঠন করার বিভিন্ন প্রতিকূলতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'পেটের তাগিদে নয়, বাংলা মায়ের ঐতিহ্যকে দেশে দেশে পৌঁছে দেয়ার জন্য সংস্কৃতি চর্চা করি।' তিনি দর্শকদের শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠান উপভোগ এবং Hall পরিষ্কার রাখার জন্য অনুরোধ করেন।

কোরাসের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং দলীয় সঙ্গীত দিয়ে শেষ হয়। নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি, একাঙ্কিকা, কাওয়ালি সব কিছুই অনুষ্ঠানে স্থান পায়।

উত্তরণের বেশ কিছু সদস্য জাপানিজ হওয়ায় এবং জাপানি দর্শকদের কথা মাথায় রেখে জাপানিজ গান এবং নাচও অনুষ্ঠানে শোভা পায়। এ ছাড়া উপস্থাপনায়ও জাপানিজরা অংশগ্রহণ করে। তবে উত্তরণের সবচেয়ে প্রশংসার দিকটি হল সময় মেনে চলা।

ই । টা । লি

বাংলাদেশীরা ব্যবসায় যাচ্ছে

প্রাচীন সভ্যতার দেশ ইটালিতে বর্তমানে প্রায় ৭০ হাজার বাংলাদেশী বসবাস করছে। এর মধ্যে বৈধ ও অবৈধ রয়েছে। তবে অবৈধের চেয়ে বৈধই বেশি। দিন দিন সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বৈধরা চাকরির পাশাপাশি ব্যবসায়ও মন দিয়েছে। ইটালির প্রায় সব শহরে বাংলাদেশীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। দিন দিন সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজধানী রোমেই বেশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আলিমেন্টারি, মাছ, মাংস, শাক-সবজি, ফল, কসমেটিক, বিভিন্ন খাদ্য সমাগ্রী, ভিডিও গিফ্ট আইটেম, ট্রাভেল তাসস্সি, মানিগ্রাম, ভিডিও, সেলুন, রেস্টুরেন্ট, পিজ্জেরিয়া, জুয়েলারিসহ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। রোমের খুব কম রাস্তাই পাওয়া যাবে যেখানে বাংলাদেশীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নেই। তবে সবচেয়ে বেশি টেলিফোন, ফ্যাক্স ও ইন্টারনেটের দোকান। কোনো কোনো এরিয়ায় একজনের দেখাদেখি আরেকজন অনেকটা ব্যাঙের ছাতার মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। আগ-পিছ চিন্তা না করে এসব করার ফলে ৬ মাস পর লোকসান দিয়ে ব্যবসা ছেড়ে দিতে হচ্ছে। দৌড়ের প্রতিযোগিতায় এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে, ইটালিতে স্থানীয় ফোনে কথা বলতে যে পয়সা খরচ হয় তার থেকেও অর্ধেক পয়সা খরচ হয় বাংলাদেশে কথা বলতে। কে কত কমে দিয়ে কাস্টমারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সে চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু এদিকে মাস শেষে বিভিন্ন খরচ বাদ দিয়ে যখন কিছুই থাকে না তখন কয়েক মাস পর বাধ্য হয়ে 'ছেড়ে দে-মা কাইন্দা বাঁচি' অবস্থা হয়। এ ধরনের অব্যবসায়িকে প্রবণতা শুধু বাংলাদেশীদের মধ্যে বেশি। এতে সত্যিকারের ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিদেশীরা আমাদের কার্যকলাপ দেখে হাসি-ঠাট্টা করছে।

বর্তমানে ইটালিতে চাকরির বাজার ভালো নয়, তাই প্রবাসীরা ব্যবসার দিকে ঝুঁকছে বেশি। তবে পরিকল্পিতভাবে এগুলে নিশ্চয়ই ভালো করতে পারবে। কোন স্থানে কোন ব্যবসা ভালো চলবে, যোগ-বিয়োগ করে বসতে হবে। অন্য টেলিফোনের দোকান খুলেছে আমিও একটা খুলবো, এ ধরনের মনমানসিকতা নিয়ে নয়। সত্যিকারের ব্যবসায়িক মনমানসিকতা নিয়ে এগুতে হবে। না হয় 'আমও যাবে ছালাও যাবে'। অনেকে দেশ থেকে টাকা-পয়সা এনে এখানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। দেশে যে ধরনের অরাজকতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সন্ত্রাসীদের তান্ডব চলছে তারচেয়ে এখানে আর যাই হোক দু'বেলা খেয়ে শান্তিতে ঘুমাতে পারছি। ছেলেমেয়ে নিয়ে টেনশনে থাকতে হচ্ছে না। যদিও ছেলেমেয়ের পড়ালেখার সমস্যা হচ্ছে। এখানে বাংলা বা ইংরেজিতে পড়ানো যাচ্ছে না। বাংলাদেশীদের এতো ছেলেমেয়ে থাকা সত্ত্বেও আজও ইটালিতে পূর্ণাঙ্গ বাংলা স্কুল খোলা সম্ভব হয়নি নেতৃস্থানীয় নেতাদের কারণে। সবাই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা বড়ই কঠিন। ছেলেমেয়েরা বিদেশী কালচারে অভ্যস্ত হয়ে বড় হচ্ছে, তারপরও অনেকে মনে করেন সন্ত্রাসীদের হাতে মার খাওয়ার চেয়ে এখানেই ভালো। কাজ করছি, খাচ্ছি, শান্তিতে ঘুমাতে পারছি। তাই প্রবাসীরা বিদেশেই বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে নিজেদের স্থায়ী আবাস গড়ে তুলছে। এ দেশের জন্য ভালো নয়, সরকারকে সেটা বুঝতে হবে। রোমের সেই 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠান থেকে আজ ইটালিতে হাজার হাজার বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান। রোম ছাড়াও মিলানো, ভিসেন্সা, ভেনিস, প্রাতো, ফিরেন্স, পিজা, টরিনা, মানতোভা, পাদভা, বুলঝানো, পালেরমো, বারি প্রভৃতি শহরে বাংলাদেশীদের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তবে রোমের বাইরে অনেক বাংলাদেশী দোকানের নাম ইন্ডিয়ান ফ্যাশন। ইন্ডিয়ান বাজার, কলকাতা স্টোর ইত্যাদি নাম রাখায় অনেকে এ ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আর যারা এই নামে প্রতিষ্ঠান করেছেন তারা বলেছেন ব্যবসার টেক্নিকে এটা করেছেন।

ইটালিতে চীনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই বেশি। ইটালির এমন কোনো প্রভিন্স নেই, যেখানে চীনাদের প্রতিষ্ঠান নেই। তবে তারা আমাদের মতো অন্যের দেখাদেখি প্রতিষ্ঠান গড়ে না। কোথায় কি ব্যবসা করলে ভালো হবে ভালোভাবে চিন্তা করে তারপর করে। কিন্তু আমরা অন্যের দেখাদেখি করি।

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতায় রোমের Piazzale Alessandrino-তে ১০ অক্টোবর মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে Mini Super Market বিদেশে বিশেষ করে ইটালিতে আমাদের বাংলাদেশীদের একটি সুনাম রয়েছে। আমরা যদি আমাদের সুনাম অক্ষুণ্ন রেখে বিদেশে আমাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাই তাহলে এ দেশে আমাদের অবস্থান আরো সুদৃঢ় হবে। আমরাও কামিয়াব হবো ইন্‌শাল্লাহ।

Manik Chowdhury
P.LE. Alessandrino-3
00172.Rome, Italy
e-mail-manikitalia@yahoo.it.
celu: 347-7858756

কোরিয়া প্রবাসীদের আতঙ্ক

বর্তমানে কোরিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা বড়ই নাজুক। দিন দিন বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছোট ফ্যাক্টরিগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এসব ফ্যাক্টরিতে সর্বাধিক প্রবাসী শ্রমিক কাজ করতো। কোরিয়ার শিল্প বিপ্লবের সময় সহজ শর্তে পর্যাপ্ত ব্যাংক ঋণের কল্যাণে গড়ে উঠেছিল এসব ছোট ছোট ফ্যাক্টরি। প্রায় প্রতিটি বাড়িই এক একটি ফ্যাক্টরি হিসেবে গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে এসব ছোট ছোট ফ্যাক্টরিতে খুবই খারাপ অবস্থা। অনেকে বাধ্য হয়ে ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দিচ্ছে, না হয় যেখানে কম দামে শ্রমিক পাওয়া যায় সেই সব দেশে কাজ চলে যাচ্ছে। চীন, ভিয়েতনাম, মঙ্গলিয়া ইত্যাদি দেশ এই তালিকার শীর্ষে। এমতাবস্থায় চাকরি হারাচ্ছে দেশী-বিদেশী শ্রমিক। যাদের ভিসা নেই তারা নতুন করে চাকরি পাচ্ছে না। চাকরি না পেয়ে বেকার বসে থেকে থেকে হতাশ হয়ে অনেকেই দেশে ফিরে যাচ্ছে। গত জুলাই মাসে কোরিয়ান সরকার ছয়টি দেশের সঙ্গে নতুন শ্রম চুক্তি করেছে। দেশগুলো হচ্ছে- চীন, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন এবং থাইল্যান্ড। উল্লিখিত দেশগুলো থেকে দক্ষ শ্রমিক আসছে। তাই মালিক পক্ষের কাছে কাজে দক্ষ এবং ভাষা জানা হলেও ভিসাবিহীন শ্রমিকের চাহিদা কমে যাচ্ছে। কারণ ভিসাবিহীন কর্মরত শ্রমিক ধরা পড়লে মালিকদের জন্যে জরিমানার বিধান রয়েছে। গত কয়েক দিনে ধরপাকড় এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে প্রবাসীরা আতঙ্কের মধ্যে আছে কখন কে কোথায় ধরা পড়ে যায়। শ্রম আইন সব দেশের শ্রমিকদের জন্যে সমভাবে প্রযোজ্য হলেও ৩-৪টি ঘটনার দরুন এখানে মুসলিম দেশসমূহ এবং বাংলাদেশীদের অবস্থা বড়ই করুণ। ইরাকে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হাতে এক অপহৃত কোরিয়ানের শিরচ্ছেদ হলে মুসলিম দেশসমূহের প্রতি এরা বৈরী আচরণ শুরু করে। এদিকে আল-কায়েদা কর্তৃক কোরিয়াতে হামলার হুমকি। জামায়াতের সহযোগী সংগঠন 'দাওয়াতুল ইসলাম কোরিয়ার' আল-কায়দার সঙ্গে যোগাযোগ আছে, সংসদে একজন সদস্যের অভিযোগ এবং বাংলাদেশ থেকে কোরিয়ান ওন (মুদ্রা) বানিয়ে এনে ধরা পড়েছে এক বাংলাদেশী ইত্যাদি কারণে এখানে প্রবাসী বাংলাদেশীরা চরম বিপর্যয়ের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা যারা ভিসা নিয়েছিল তাদের। কারণ ইমিগ্রেশনে তাদের সব তথ্য নিবন্ধন করা আছে। ভিসা শেষ হয়ে গেলে নির্দিষ্ট ফ্যাক্টরিতে হানা দিচ্ছে ইমিগ্রেশন পুলিশ। তাই অনেক ফ্যাক্টরিতে ভিসা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাঁটাই করে দিচ্ছে মালিক পক্ষ। সব মিলিয়ে ভালো নেই কোরিয়া প্রবাসী বাঙালিরা। ভবিষ্যতে কি হবে, কি হচ্ছে এমনি চিন্তায় অস্থির সবাই।

মোঃ আবুল বাহার, সিউল, কোরিয়া

সিঙ্গাপুর

মা'কে হারাবার ভয়

তির তির করে সময়ের কাঁটা ঘুরতে ঘুরতে প্রবাস জীবনের ছয়টি বছর অতিবাহিত হতে চলেছে। দারিদ্র্যকে পরাজিত করার অঙ্গীকার নিয়ে; মা, বাবা, বোন, ভাবিদের স্নেহ ও ভালোবাসার বন্ধনকে ছিন্ন করে প্রবাস জীবনে পা রেখেছি। এখানে কোম্পানির পরিশ্রমের কাজ শেষে বাসায় ফিরে রান্নাবান্না এসব নিয়ে এতোই ব্যস্ততা যেন, জীবন যুদ্ধের নতুন একটি রণক্ষেত্রে যোগ দিয়েছি। তারপরও মাস শেষে যখন বেতনের টাকা হাতে পাই তখন সব কষ্টের গ্লানি মুছে যায়। আরো ভালো লাগতো বাড়ি থেকে যখন ছোট-বড় সবার লেখা সান্ত্বনামূলক চিঠি পেতাম। বাবার লেখা উপদেশমূলক চিঠি কম করে হলেও দুবার পড়তাম। সবকিছু মিলে সুন্দরভাবেই অতিবাহিত হতে চলছিল প্রবাস জীবনের সুখ-দুঃখের দিনগুলো। কিন্তু অকল্পনীয় এক দুঃসংবাদ আমার জীবনটাকে মলিন করে দেয়। বাড়ি থেকে ফোন আসে বাবা হার্টস্টোক করে হাসপাতালে আছে। মুহূর্তের মধ্যেই যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাই। বাড়িতে জানিয়ে দেই যত টাকা লাগে দেবো। তবুও বাবার চিকিৎসায় যেন অবহেলা না হয়। প্রতিদিন মোবাইলে ফোন করে বাবার শয্যাপাশে থাকা ভাই-বোন, মা'সহ আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলি। কিন্তু যার সঙ্গে কথা বলার জন্য হৃদয়টা ব্যাকুল হয়ে আছে সেই বাবার সঙ্গে কথা বলতে পারি না। সান্ত্বনা আছে কিন্তু আমার প্রতি মুহূর্তের অস্থিরতা বাবার কণ্ঠের কথা শোনার। এ অস্থিরতায় একটি সপ্তাহ অতিক্রম হয়ে গেল। দুই ভাই সিঙ্গাপুরে চাকরি করা সূত্রে বড় ভাই আলমগীরকে সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশে পাঠালাম। সে দেশে যাওয়ার পর তাকে ফোন করি। তার কণ্ঠেও শুনি ছোট্ট মিথ্যের বিচলিত সান্ত্বনার বাণী 'বাবা ভালো আছে'। অথচ গত এক সপ্তাহ আগেই বাবা পরলোক গমন করেছেন। খরবটা পেলাম রুমমেটদের কানাঘুষা আলোচনায়। বাবা আমার পৃথিবীর সব মায়া, মমতার বাঁধন ছিঁড়ে চিরবিদায় নিয়েছেন। জীবন গড়ার সুখ, স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। বাবার প্রচন্ড ইচ্ছে ছিল শেষবারের মতো আমাকে দেখার। বাবার শেষ ইচ্ছে পূর্ণ হলো না। এখন প্রবাস জীবনের শত উপার্জনের টাকা দিয়েও হারানো বাবাকে এ জীবনে কখনো ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। সম্ভব নয় আমার জীবনের সবকিছুর বিনিময়েও। প্রবাসীদের জীবনে এ স্বজন হারানোর ব্যথা যে কতো বেদনাদায়ক তা এক প্রবাসীই অনুধাবন করতে পারে।

প্রবাসে পরিচ্ছন্ন পরিবেশে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করলেও এখানে নেই কোনো ভালোবাসার ছোঁয়া। নেই প্রিয়জনের আন্তরিকতা। বিভিন্ন সমস্যার কারণে দীর্ঘকাল বাবা-মায়ের কাছে যেতে পারিনি। তাদের আদর-স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। স্নেহের, আদরের নিপা, শিরিন, পাপড়ি, রিফাত ওদের ছোট তুলতুলে হাতের আদরমাখা ছোঁয়া পেতে মন ব্যাকুল হয়ে থাকে। তবুও জানি অন্ধকারের পরই আলো আসবে। এ রাতের অন্ধকার কেটে ভোরের রঙিন রশ্মিতে আলোকিত হবে এ মন। শুধু বাবা নয়, একে একে হারিয়েছি নিকটাত্মীয়সহ গ্রাম, প্রতিবেশী। জানি না আর কতো হারানোর পালা অপেক্ষা করছে আমার জন্য। বাবাকে হারিয়ে এখন আমার ভয়, দুঃস্বপ্ন 'মা'কে নিয়ে। 'মা' জানি কখন বাবার মতো আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে যায়। বাড়িতে ফোন করলেই মায়ের আকুতি, বাবা তুমি দেশে চলে আস। তোমাকে দেখতে মন চায়। তোমার বিয়েটা দেখে যেতে চাই ইত্যাদি। এখানে শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমার উড়ন্ত মনটি ক্ষণিকের জন্য চলে যায় মায়ের আঁচলের ছোঁয়া পেতে। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ছুটিতে দেশে যাওয়ার। ছুটি কাটিয়ে মাকে কষ্ট দিয়ে আবারও চলে আসবো। প্রবাসে এসেই হয়তো আবার হারানো সংবাদ পেতে থাকবো। বিদেশে নিজেদের শ্রম, মেধা দিয়ে যখন বাংলাদেশের সুনাম বাড়াতে চেষ্টা করি তখন মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর নিউজ পেপারে ভেসে আসে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের চিত্র। ভেসে আসে লঞ্চডুবি, গাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ, বন্যায় অনাহারে থাকা মানুষের ছবি। তখন আর আমরা তাদের কাছে বড় হয়ে থাকতে পারি না। তারা তখন নির্দ্বিধায় বলে you are very poor. আমরা প্রবাসে যখন স্বজন হারানোর বেদনায় কাতর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিরা তখন নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের চাওয়া, সর্বক্ষণ নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত না থেকে দেশের জন্য কিছু করেন। যাতে প্রজন্মকে আমাদের মতো প্রবাসী হতে না হয়। দূর থেকে স্বজন হারানোর কষ্টের মুখাপেক্ষী হতে না হয়। আর জনগণ যেন Lekuan Yew এবং মাহাথির মোহাম্মদের মতো আপনাদেরও সারা জীবন শ্রদ্ধা করে। আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ, নিজেদের স্বার্থের জন্য দেশ ও জাতিকে এভাবে কষ্ট দেবেন না।

Jahangir Alam Jahid
ACP Metal Finishing, Singapore

কোরিয়ায় বাংলাদেশী হুন্ডি ব্যবসায়ীরা ধরাশায়ী

অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান অনেক হাঁক-ডাক দিয়ে বাংলাদেশে হুন্ডির মাধ্যমে অবৈধ লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হলেও অবশেষে দক্ষিণ কোরিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশী হুন্ডি ব্যবসায়ীরা এ দেশীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে ধরাশায়ী হয়ে কেউ কোরিয়া ছেড়ে পালিয়েছে, কেউ বা নাম পরিচয় গোপন করে মিল-কারখানায় কাজে লেগে গেছে। গত এক যুগ যাবৎ কোরিয়া থেকে শ' শ' কোটি টাকা হুন্ডির মাধ্যমে বাংলাদেশে লেনদেন হলেও ব্যাপারটি কোরিয়ার আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নজরে আসেনি কিংবা তারা বিষয়টি আমলে নেয়নি। সম্প্রতি কোরিয়ায় বহুল পরিচিত এক বাংলাদেশী হালাল ফুড ব্যবসায়ী স্বদেশী আরো কয়েকজনের ষড়যন্ত্রে পুলিশের কাছে ধরা পড়লে ধৃত ব্যক্তির কাছে প্রায় ৫ কোটি ওয়ান পায়। পুলিশ এই টাকা অবৈধ বলে চ্যালেঞ্জ করলে ধৃত ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হয়ে কোরিয়ার প্রায় সব হুন্ডি ব্যবসায়ীর নাম ঠিকানা, ফোন নাম্বারসহ কোন পদ্ধতিতে হুন্ডির টাকা লেনদেন হয় সব তথ্য জানিয়ে দেয়। এতে পুলিশের টনক নড়ে। বিষয়টি গোয়েন্দা সংস্থাকে অবহিত করার পর পরই শুরু হয় হুন্ডি ব্যবসায়ীদের আস্তানায় হানা। যেসব ব্যাংকে হুন্ডি ব্যবসায়ীরা কোটি কোটি কোরিয়ান ওয়ান লেনদেন করতো সেসব ব্যাংকে গোয়েন্দাদের আনাগোনা বেড়ে যায়। বিষয়টি আঁচ করতে পেরে বড় বড় হুন্ডি ব্যবসায়ীরা দ্রুত সটকে পড়ে কোরিয়া থেকে। ওদের চেলা-চামচারা জড়িত ছিল তারা নাম ধাম গোপন করে মিল-কারখানায় কাজকর্মে লেগে যায়। গত মাসে বাংলাদেশে কোরিয়ার নতুন রাষ্ট্রদূত প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কাছে পরিচয়পত্র পেশ কালে বলেছেন, প্রায় ২২ হাজার বাংলাদেশী সুনামের সঙ্গে কোরিয়ায় কাজ করছে। এই সংখ্যা যদি আমরা ২০ হাজারে এনে প্রতিটি কর্মীর মাসিক সঞ্চয় কর্মের ভেতর ৫০ হাজার টাকা ধরি, তাহলে দেখা যায় বছরে প্রায় ১২০০ কোটি টাকা এ যাবৎ হুন্ডির মাধ্যমে দেশে গেছে। হুন্ডির মাধ্যমে টাকা দ্রুত পৌঁছায়। ব্যাংক থেকে লাভজনক এবং ঝামেলামুক্ত বিধায় বাংলাদেশীদের শত ভাগ এতোদিন এই মাধ্যমে টাকা পাঠিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। হুন্ডি ব্যবসায়ীরা ধরাশায়ী হওয়ায় বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকে কোরিয়া থেকে বছরে বাড়তি প্রায় ১২০০ কোটি টাকা লেনদেন হবে বলে অনুমান করা যাচ্ছে। এতে দেশে রেমিটেন্স বাড়বে।

মোরশেদ আলম (প্রিন্স), দক্ষিণ কোরিয়া

জা । র্মা । নি

জার্মানিতে সংশোধিত অভিবাসন আইন

জার্মানিতে অভিবাসন আইনে ব্যাপক সংস্কার করা হয়েছে। জার্মান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অটো শিলি ৩ আগস্ট ২০০১ জার্মান সংসদের উচ্চকক্ষ বুন্ডেসটাগে নতুন অভিবাসন আইন সংক্রান্ত একটি খসড়া বিল উত্থাপন করেছিলেন। বিলটি জার্মান সংসদে চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হবার ঠিক আগ মুহূর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘটে যায় ভয়াবহ এক সন্ত্রাসী হামলা। ১১ সেপ্টেম্বরে টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলার পর স্থগিত হয়ে যায় অভিবাসন আইন সংস্কারের সকল কার্যক্রম। সরকার পক্ষ এবং বিরোধী জোটের প্রবল বাক-বিতন্ডার পর অবশেষে গত ৯ জুলাই ২০০৪ আইনটি ব্যাপক রদবদল করে অনুমোদিত হয়। আইনটির বিশেষত্ব হচ্ছে, এখন থেকে জার্মানি শুধু রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদেরই গ্রহণ করবে না, বরং জার্মানির শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী সারা পৃথিবী থেকে দক্ষ লোকদের অভিবাসনের মাধ্যমে জার্মানিতে চাকরি এবং বসবাসের সুযোগ দেবে। পাশাপাশি রাজনৈতিক আশ্রয় আইনটিও কঠোরভাবে সংশোধন করে আশ্রয়প্রার্থীদের এ দেশে আশ্রয় প্রার্থনার জন্য প্রবলভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ অনিশ্চয়তার মাঝে ঝুলে থাকা রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের স্থায়ীভাবে বসবাসের (শর্ত সাপেক্ষে) অনুমতি প্রদানের পাশাপাশি সন্ত্রাস ও অপরাধপ্রবণ বিদেশী নাগরিকদের জার্মানি থেকে বহিষ্কার করার জন্য কঠিন ধারা সংযোজিত করা হয়েছে। ২০০১ সালে উত্থাপিত বিলটির প্রস্তাব অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে যে শরণার্থী দপ্তর ছিল, সেটিকেই বর্তমানে জার্মান অভিবাসন ও শরণার্থী দপ্তর (Bundesamt fuer Migration und Fluechtlinge) নামে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সংস্থাটি কাজ শুরু করতে যাচ্ছে ১ জানুয়ারি ২০০৫ সাল থেকে। একই দিন থেকে শুরু হবে ১ জুলাই ২০০৪ জার্মান সংসদের উচ্চকক্ষে এবং ৯ জুলাই ২০০৪ জার্মান সংসদের নিম্নকক্ষে অনুমোদন হওয়া সংশোধিত ইমিগ্রেশন আইনের কার্যকাল। খসড়া আইনটির অনেকগুলো ধারা, বিশেষত অভিবাসন প্রদান সংক্রান্ত কানাডীয় পয়েন্ট পদ্ধতি বাতিল এবং অপরাধপ্রবণ বিদেশীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ায় জার্মানির মানবাধিকার এবং শরণার্থী সংস্থাগুলো সংশোধিত আইনটির ব্যাপক সমালোচনা করেছে। আইনটির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিম্নরূপ :

দক্ষ ও মেধাবী লোকের অভিবাসন

দক্ষ ও মেধাবী পেশাজীবী লোক (Fach-und Fuehrungskraft), যেমন প্রকৌশলী, তথ্য প্রযুক্তিবিদ ও গণিতজ্ঞ ইত্যাদি পেশার যেকোনো বিদেশী জার্মানিতে অভিবাসনপ্রাপ্ত হতে পারেন, যদি জার্মানির কোনো নিয়োগকর্তা তাদের জন্য জার্মান শ্রম দপ্তরে আবেদন করেন। এ ধরনের অভিবাসীদের প্রথম থেকেই একটি চিরস্থায়ী ভিসা প্রদান করা হবে। প্রস্তাবে উল্লেখিত জার্মান ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি শিক্ষা কোর্সে (Integrationskurs) অংশগ্রহণ করার বাধ্যবাধকতা থেকে তাদের অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

ছাত্র এবং স্বনিয়োজিত

জার্মানিতে অধ্যয়নরত বিদেশী ছাত্ররা তাদের পড়াশোনা শেষে শ্রম দপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে কর্মে নিয়োজিত হতে পারেন। পড়াশোনা শেষে যদি কোনো বিদেশী ছাত্র তার শিক্ষাগত যোগ্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো চাকরির ব্যবস্থা না করতে পারে, তাহলে তাকে চাকরি সন্ধানের জন্য সর্বোচ্চ এক বছরের অস্থায়ী ভিসা প্রদান করা হবে। জার্মানিতে উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত বিদেশী ছাত্রদের জার্মানি ছাড়া অন্য কোনো শিল্পোন্নত দেশে অভিবাসিত হতে নিরুৎসাহিত করার জন্যই এই পদ্ধতির অবলম্বন। এছাড়াও বিভিন্ন পেশার স্বনিয়োজিত প্রার্থীরাও দরখাস্ত সাপেক্ষে অভিবাসিত হতে পারেন, যদি সেই প্রার্থীর অভিবাসনপ্রাপ্তির সঙ্গে জার্মানির অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত থাকে। কমপক্ষে এক মিলিয়ন ইউরো বিনিয়োগ করে কমপক্ষে দশজন লোকের কর্মসংস্থান হয় এমন কোনো দোকান, কারখানা, শোরুম বা গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে যেকোনো বিদেশী নাগরিক জার্মানিতে অভিবাসিত হতে পারেন।

পারিবারিক অভিবাসন

জার্মানিতে অভিবাসিত পিতামাতাকে স্বদেশে অবস্থানরত তাদের সন্তানদের বারো বছর বয়স পূর্ণ হবার আগেই এ দেশে নিয়ে আসতে হবে, যদি তারা তাদের সন্তানদেরও অভিবাসন করাতে চান। পূর্বে এ বয়সসীমা ছিল ষোলো বছর। বয়সসীমা কমিয়ে আনার উদ্দেশ্য হলো, অভিবাসনপ্রার্থী শিশুদের এ দেশের ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে শিশুকাল থেকেই পরিচিত করে তোলা। এ ক্ষেত্রে বয়সসীমার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে শুধু সেসব অভিবাসনপ্রার্থী শিশুর জন্য, যারা জার্মানির বাইরে বসবাস করলেও জার্মান ভাষা ও সংস্কৃতির মাঝেই বড় হচ্ছে। তাছাড়া দক্ষ পেশাজীবী, যারা জার্মানিতে অভিবাসনপ্রাপ্ত হয়ে চিরস্থায়ী ভিসা পাবেন,

দ: । কো । রি । য়া

দক্ষিণ কোরিয়ায় জাল নোট : আসামি বাংলাদেশী

গত ১-১১-২০০৪ কোরিয়ান টেলিভিশন চ্যানেল MBC রাত নয়টার খবরে প্রচার করে যে, বাংলাদেশ হতে আগত এক ব্যক্তির কাছ থেকে প্রায় ৮০ লাখ কোরিয়ান জাল ওন উদ্ধার করে। যা নাকি ঢাকার কোনো এক ছাপাখানা হতে ছাপানো হয়েছে। ঐ ব্যক্তিদের অফিস এবং ছাপাখানার চিত্রও খবরে প্রচার করা হয়। প্রবাসে যাদের চরিত্র এভাবে প্রকাশ পায় স্বদেশে তাদের ভাবমূর্তি কতোটুকু উজ্জ্বল তা যেকোনো বিবেকবান ব্যক্তি একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন। বর্তমান বিশ্বে প্রবাসীরা নানাবিধ সমস্যার কারণে খুবই নাজুক অবস্থার ভেতরে দিনাতিপাত করছে। তারপরও যদি এহেন অসৎ ব্যক্তিদের চরিত্রের এতোটুকু পরিবর্তন হয়। উল্লেখ্য যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর অধিকাংশ প্রবাসীই উন্নত দেশে অবৈধভাবে বসবাস করে। দেশবাসী এবং প্রবাসী ভাইদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা এহেন ব্যক্তিদের ব্যাপারে সাবধানে থাকুন। এরা যেকোনো সময় দেশ ও জাতির বিপদ ডেকে আনতে পারে।

Bahauddin Ahamed Khokon, Song-Sulga, 3 Dong, Seoul, Korea

তারা তাদের আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করেই জার্মানিতে নিয়ে আসতে পারবেন। যেকোনো শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী অভিবাসনপ্রাপ্ত যেকোনো ব্যক্তির অভিবাসনপ্রাপ্ত সন্তানরাও এ দেশে যেকোনো প্রকার কর্মে নিয়োজিত হবার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত হবেন।

মানবাধিকারের ভিত্তিতে অভিবাসন

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষ্যমতে, মানবাধিকারের ভিত্তিতে এ দেশে বসবাসের অনুমতি প্রদানের পদ্ধতিটি পূর্বে যথেষ্ট কার্যকর ছিল না। পূর্বে কোনো ব্যক্তিকে মানবাধিকারের ভিত্তিতে জোর করে তার স্বদেশে ফেরতও পাঠানো হতো না, আবার অবস্থানের অনুমতিপত্র দিয়ে অভিবাসনও দেয়া হতো না। অর্থাৎ ব্যাপারটি ছিল দীর্ঘকাল ঝুলে থাকা একটা বিষয়। আইনটিতে এবার সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের, যারা স্বদেশে ফিরে যেতে সত্যিকার অর্থেই অসমর্থ এবং যারা স্বদেশে ফিরে যেতে সমর্থ, কিন্তু ইচ্ছুক নয়। যারা সত্যিকার অর্থেই স্বদেশে ফিরে যেতে অসমর্থ তারা অস্থায়ীভাবে অভিবাসিত হবেন, যদি না তারা পূর্বে কোনো সামাজিক অপরাধের কারণে দন্ডপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন অথবা সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িত থাকেন অথবা জার্মানির জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকির কারণ হয়ে থাকেন। এই শ্রেণীর অন্য দলটি, যারা স্বদেশে ফিরে যেতে সমর্থ হলেও ইচ্ছুক নন, তাদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠাবার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ ধরনের প্রার্থীদের স্বাধীনভাবে বাইরে চলাফেরা করতে দেয়া হবে না এবং সুনির্দিষ্ট বহিষ্কার-ক্যাম্পে তাদের অবস্থান করার জন্য বাধ্য করা হবে। নাম, পরিচয় ও জাতীয়তা গোপনকারী ব্যক্তিকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। তাছাড়া কোনো গির্জা কর্তৃপক্ষ যদি মানবাধিকারের ভিত্তিতে অভিবাসনপ্রার্থী কোনো ব্যক্তির আনুষঙ্গিক খরচাদি বহনে সম্মত হয়, তাহলে বিশেষ ব্যবস্থায় কোনো ব্যক্তি অভিবাসন পেলেও পেতে পারেন।

জার্মান ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি শিক্ষা কোর্স

'অ' তে অজগর, অজগর ঐ আসছে তেড়ে- এবার শুরু করতে হবে আদর্শলিপি দিয়ে। যেসব বিদেশী নাগরিকের এ দেশে বসবাসের মেয়াদ ছয় বছর পূর্ণ হয়নি এবং জার্মান ভাষায় যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করতে সক্ষম হননি, তাদের বাধ্যতামূলকভাবে এ দেশের ভাষা, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ওপর একটি বিশেষ কোর্সে (Integrationskurs) অংশগ্রহণ করতে হবে। নিরক্ষর বিদেশীদের জন্য সর্বত্র খোলা হচ্ছে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, যেখানে 'মূর্খ' বিদেশীদের মূলত জার্মানিমুখী হবার শিক্ষা দেয়া হবে। উপযুক্ত কারণ ছাড়া কেউ এই কোর্সে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে তার ভিসা নবায়নে এবং চিরস্থায়ী ভিসা (Niederlassungserlaubnis) পেতে যথেষ্ট জটিলতার সৃষ্টি হবে। তাছাড়া কেউ যদি বেকার ভাতা বা সামাজিক ভাতার ওপর নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও এ কোর্স করতে অস্বীকৃতি জানান, তাহলে ভাতার অর্থ ক্রমশ কমতে থাকবে। চিরস্থায়ী ভিসা পাবার শর্তগুলোর মধ্যে যা যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, জার্মান ভাষায় যথেষ্ট পরিমাণ দক্ষতা, জার্মান ইতিহাস, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি ছাড়াও জার্মান সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইন সম্পর্কে নিদেন পক্ষে ধারণা থাকা। কেউ যদি এই কোর্সের ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সরকার তা বহন করবে।

রাজনৈতিক আশ্রয় প্রক্রিয়া

দীর্ঘদিন যাবৎ আশ্রয় মামলা নিয়ে ঝুলে থাকা রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীরা প্রদেশের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ বরাবর 'বিশেষ ব্যতিক্রম' ব্যবস্থায় (Haertefall) স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতির জন্য আবেদন করতে পারেন, যদি না তারা কোনো সন্ত্রাস, রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ বা অপরাধমূলক কর্মকান্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কারণে পূর্বে দন্ডপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। এই বিশেষ ব্যবস্থার জন্য প্রতিটি প্রদেশে Haertefallkommission নামে একটি কমিশন গঠন করা হয়েছে। ঠিক কতো বছর যাবৎ ঝুলে থাকা রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীরা এ ব্যবস্থায় আবেদন করতে পারবেন বা আদৌ অভিবাসনপ্রাপ্ত হতে পারবেন কি না তা কমিশনের সম্পূর্ণ নিজস্ব এখতিয়ার। দীর্ঘদিন যাবৎ ঝুলে থাকা আশ্রয়প্রার্থীদের যেকোনো অথবা সমস্ত আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার সব অধিকার এ কমিশন সংরক্ষণ করে। জেনেভা কনভেনশনের আওতায় নতুন যারা জার্মানিতে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করবেন, তাদের আশ্রয় প্রার্থনা প্রচলিত ধারায় সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হবে। অভিবাসন প্রদানের তিন বছর পর আশ্রয়প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট দেশের ওপর ফেডারেল বৈদেশিক দপ্তরের (Auswaertigesamt) বাৎসরিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আশ্রয়প্রার্থীর মামলা পুনঃতদন্ত করা হবে এবং তদন্তে যদি প্রমাণ হয় যে আশ্রয়প্রার্থী তখনো তার দেশে রাজনৈতিক সমস্যার শিকার, শুধু সে ক্ষেত্রেই তাকে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য অনুমতি প্রদান করা হবে। একজন রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীর ক্ষেত্রে শুধু রাজনৈতিক আশ্রয় আইন (Asylrecht) প্রযোজ্য হবে, কখনোই অভিবাসন আইন (Einwanderungsrecht) নয়।

মোঃ ইসমাইল হোসেন বাবু
Friedberger Anlage 3
60314 Frankfurt, Germany.

ই। টা। লি

প্রবাসী জীবন ও ভাষা শিক্ষা

ইটালিতে বর্তমানে কাজের খুব সঙ্কট। পূর্ব অভিজ্ঞতা বা ভাষার ওপর দক্ষতা ছাড়া কাজ জোটানো খুবই কঠিন। তাই আমাদের দেশের মানুষের এখন চোখ কান খুলেছে। কিছুদিন আগে আমি আমার এক পরিচিত লোককে নিয়ে গিয়েছিলাম ভাষার কোর্সে ভর্তির জন্য, ওখানে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। আমার খুব ভালো লাগলো। না, আমরা কেন ঘরে বসে থাকবো। আর কতোদিন পরনির্ভরশীল হয়ে থাকবো। সেখানে প্রাপ্তবয়স্ক অনেক ভদ্রলোকসহ ভদ্রমহিলা উপস্থিত দেখলাম। ইটালিতে সাধারণত ভাষা শিক্ষা দেয়া হয় সপ্তাহে দু'দিন। ৩-৪ ঘণ্টা করে প্রতিদিন। সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে ভর্তি হওয়া যায়। ভাষার কোর্সে সাধারণত প্রথম অবস্থায় কিভাবে একজনের সঙ্গে কথা বলতে বা কি কথা খুব প্রয়োজনীয়, সেটা শিক্ষা দেয়া হয়। টেপ রেকর্ডার দিয়ে বা টিভির মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয়। আমরা সাধারণভাবে কথা বলতে গেলে আপনি আর তুমি গুলিয়ে ফেলি। নিয়ম অনুসারে বলতে পারি না। কিন্তু ওরা বুঝে নেয় আমরা কি বলতে চাই। যদি ভালোভাবে ওদের সঙ্গে কথা বলতে পারি কর্মক্ষেত্রে মন জয় করা খুব সহজ। ওদের থেকে অনেক সাহায্যও পাওয়া যায়। সব কিছুর মূলে রয়েছে ভাষা। আশা করি বাঙালি ভাই-বোনেরা, আমরা সবাই খুব তাড়াতাড়ি এই ভাষা সমস্যা কাটিয়ে উঠবো।

আওলাদ হোসেন অন্তু
ভেনিস, ইটালি